বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Model Answer for 2nd Semester, Hons.

Prepared by Dr. Ajoy Saha,
Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya

CC - II : বিষয় : বৈষ্ণব পদাবলী

০২ নম্বরের প্রশ্ন : বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। "অখিল মনোরথ পূর" – কে, কীভাবে 'অখিল মনোরথ' পূর্ণ করেছেন ?

উত্তর : বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পর্যায়ের 'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে' শীর্ষক পদের প্রশ্নালোচ্য পদাংশে বলেছেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব 'অখিল মনোরথ' পূর্ণ করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস এই পদে দেখিয়েছে চলমান হেমকল্পতরুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জ্ঞান ও ভক্তির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের সকলে ধেয়ে আসেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। আর মহাপ্রভু সকলকে পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। তিনি বিরামহীনভাবে অকাতরে প্রেমরত্নরূপ অপার্থিব ফল প্রদান করে বিশ্বের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

২। "তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত / গোবিন্দদাস রহু দূর।"
– কবি নিজেকে 'দীনহীন বঞ্চিত' বলেছেন কেন ?

উত্তর : চৈতন্য পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস ভাব-নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন 'অভিনব হেম কল্পতরু' রূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জ্ঞান ও ভক্তির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের সকলে ধেয়ে আসেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন। আর মহাপ্রভু সকলকে পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করছেন। তিনি বিরামহীনভাবে ভক্তকূলকে অকাতরে প্রেমরত্নরূপ অপার্থিব ফল প্রদান করে বিশ্বের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে এমন এক মহা ঐশ্বর্যময় সম্পদলাভে ভক্তকবি বঞ্চিত হয়েছেন। কারণ মহাপ্রভুর তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পর কবি গোবিন্দদাসের জন্ম হয় (আনুঃ ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ)। তাই কবি নিজেকে 'দীনহীন বঞ্চিত' বলেছেন।

৩। "তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব।" – বক্তা কাকে বনে পাঠানোর কথা বলেছেন ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন কেন ?

উত্তর : বলরামদাসের বাৎসল্যরসাত্মক 'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম' শীর্ষক পদের আলোচ্য

পঙ্‌তিতে মাতা যশোদা বালক গোপাল অর্থাৎ শিশু কৃষ্ণকে গোচারণের জন্য বনে পাঠানোর কথা বলেছেন।

গোচারণের পথে নানাবিধ বিপত্তি থাকার জন্য পরম স্নেহের ধন শিশু গোপালকে পাঠাতে মাতা যশোদার মন চায়নি। কিন্তু বিধাতা যেহেতু তাঁদের গোপ-জাতি করে এজগতে পাঠিয়েছেন এবং সমাজ জাতি-বৃত্তির দ্বারাই চালিত, তাই সন্তানের নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে তাঁর দুঃসহ উদ্বেগ ও তীব্র অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্নেহের পুত্তলি গোপালকে গোচারণের জন্য বনে পাঠাবেন। এখানে একদিকে যেমন মাতা যশোদার অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বিধাতার প্রতি একটা অনুযোগও ঝরে পড়েছে।

৪। "কি করব সো পিয়া-লেহে।" 'পিয়া-লেহে' শব্দের অর্থ কী ? কেন বক্তা এরূপ কথা বলেছেন ?

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত পদাংশটিতে 'পিয়া-লেহে' শব্দের অর্থ প্রিয়তমের স্নেহ-ভালোবাসা।

প্রবাসী কৃষ্ণের জন্য মর্মান্তিক বিরহিণী রাধাকে সখীরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে কৃষ্ণ শীঘ্রই আবার ব্রজধামে ফিরে আসবেন। 'মাথুর' পর্যায়ের বিদ্যাপতির 'অঙ্কুর তপন তাপে' শীর্ষক এই পদে রাধা সেই সান্ত্বনার উত্তরেই চরম আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, অঙ্কুর থেকেই যদি প্রখর সূর্যতাপে পুড়ে গেল তাহলে পরে জলপূর্ণ মেঘ আর কী করবে ! তেমনই তাঁর নব যৌবন যদি বিরহতাপে দগ্ধীভূত হয় সেক্ষেত্রে প্রিয়তমের স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে কী হবে ! বিরহিণী রাধার মর্মযন্ত্রণা এই আক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। "যব তুহু করবি বিচার।" – কীসের বিচারের কথা বলা হয়েছে ? বিচার করে তিনি কী পেতে পারেন বলে বক্তার মনে হয়েছে ?

উত্তর : 'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদে দেখি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বিদ্যাপতি যখন নিজেকে পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন এবং সেই মাধবের কৃপা প্রার্থনা করেছেন, তখন তার মনে হয়েছে মাধব যদি এবার তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের দোষ-গুণ অর্থাৎ পাপপুণ্যের বিচার করেন ? প্রশ্নালোচ্য পদাংশটিতে কবির জীবনব্যাপী কর্মের সেই দোষ-গুণ বিচারের কথা বলেছেন।

কবির মনে হয়েছে মাধব যদি তাঁর দোষ-গুণের বিচার করেন, তাহলে দেখবেন – সবই দোষ ; গুণের লেশমাত্র সেখানে নেই। কারণ জীবনের এতদিন তিনি জগতের পরম সত্য ও একমাত্র নিত্য মাধবকে ভুলে মায়া-মোহরূপ অনিত্যের সংসারে ডুবেছিলেন।

৬। "মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।" – কোন প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন ?

উত্তর : জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বিদ্যাপতি নিজেকে পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন

এবং কৃপা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু জীবনব্যাপী কর্মের আত্মমূল্যায়ন করে দেখেছেন এতদিন তিনি জগতের পরম সত্য ও একমাত্র নিত্য মাধবকে ভুলে মায়া-মোহরূপ অনিত্যের সংসারে ডুবেছিলেন। ফলে এই দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি চাইলেও পাপময় জীবনের কর্ম-বিপাকে আবার তাঁকে মানুষ, পশু বা কীট-পতঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে। কিন্তু কবি বিশ্বাস করেন জগন্নাথ-মাধব একদিন না একদিন তাঁকে উদ্ধার করবেনই। তাই প্রার্থনা করেছেন যতবারই তিনি এই জগতে যাওয়া-আসা করুন না কেন, সমস্ত জন্মেই যেন মাধবের প্রতি তাঁর ভক্তি অবিচল থাকে।

৭। "হরি, হরি হেন দিন হইবে আমার।" – বক্তা কোন দিনের কথা বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর : চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি নরোত্তমদাস করুণাসিন্ধু শ্রীহরি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন এমন একদিন তথা জীবন লাভের যেখানে নিত্য বৃন্দাবনের অধিবাসী হয়ে রাধাকৃষ্ণযুগলকে স্পর্শ ও দর্শন করতে পারবেন। গোপীদের অনুগত হয়ে প্রাণধন সেই যুগলের নানাবিধ সেবা ও লীলাবৈচিত্র্য উপলব্ধি করে ধন্য ও সার্থক হতে চেয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুসারী এই প্রেম সাধনাই এখানে ভগবৎ সাধনারূপে ভক্ত কবির প্রার্থনায় ব্যক্ত হয়েছে।

৮। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মূল পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর : বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি হলেন 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি। স্বাভাবিকভাবেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবন সাধনাকে কেন্দ্র করে যে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন' গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবনাগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

চৈতন্যপূর্ব যুগ তথা বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদে কৃষ্ণের মহাঐশ্বর্যরূপের প্রাধান্য পেয়েছে। অপরপক্ষে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন'-প্রভাবজাত পদে রাধাকৃষ্ণযুগলের প্রেমসত্তা প্রাধান্য পেয়েছে।

বিদ্যাপতি অনিত্য এই মায়াময় সংসার থেকে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনানুসারী প্রার্থনায় ভক্ত কবিরা মোক্ষ প্রার্থনা করেননি। তাঁরা নিত্য বৃন্দাবনের অধিবাসী হয়ে রাধাকৃষ্ণযুগলের সেবা ও লীলাবৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁদের কাছে মুক্তি নয়, প্রেম প্রার্থিত ; প্রেম সাধনাই ভগবৎ সাধনা এবং প্রেমই মুক্তি। এই বিশেষ ভাবনা বিদ্যাপতির পদে নেই।

৯। কোনও 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদ কখন 'গৌরচন্দ্রিকা' অভিধা লাভ করে ?

উত্তর : যে সমস্ত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধাভাবে ভাবিত কোনও এক রস পর্যায়ের অবস্থার বর্ণনা থাকে অর্থাৎ তখন তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনানুসারী অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ ও

বহিরঙ্গে রাধা, আর তা যখন পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ভূমিকা স্বরূপ গাওয়া হতে পারে সেই 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদ 'গৌরচন্দ্রিকা' অভিধা লাভ করে।

১০। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে 'বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার' রসাত্মক পদ রচনার প্রবণতা বেশি কেন ?

উত্তর : আমাদের জীবনের মধুরতম গান সেগুলিই যেখানে বিরহ বা দুঃখের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ উচ্ছল আনন্দ মনকে উদ্বেল করলেও তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু করুণ রস হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে, তা আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। স্বাভাবিকভাবেই এর ব্যাপ্তি ও বিশালতাও প্রগাঢ়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মধুর রসাশ্রিত পদ রচিত হয়েছে সেখানেও দেখি 'মিলন' পর্যায়ের বহুগুণ বেশি পদ রয়েছে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের। অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এজাতীয় পদ রচনার প্রবণতাই দেখা যায়। আবার কাব্যগত উৎকর্ষেও বিপ্রলম্ভেরই সিদ্ধি বেশি। কারণ সম্ভোগ বা মিলনের ক্ষেত্রটি সীমিত - বৈচিত্র্যহীন। সেখানে প্রিয়জন নিকটেই অবস্থান করেন। অন্যদিকে বিপ্রলম্ভে প্রিয়জন যেন বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত, তা বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত। এখানের কবিকল্পনার প্রগাঢ়তা রয়েছে। তাই কবিরাও বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন বিপ্রলম্ভ রসের গান গাইতে।

****

Prepared by Dr. Ajoy Saha, Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya